মনসামঙ্গল কাব্য: মানবচিন্তা, দার্শনিক ভাবনা ও নৈতিক দ্বিধার রূপায়ণ
[Manasamangal Kavya: The Portrayal of Human Thought, Philosophical Ideas and Moral Dilemmas]

Sultana P.

Abstract

Manasamangal is a significant work of medieval Bengali literature that reflects profound human thought, philosophical ideas, and moral dilemmas. This study employs historical, textual, and comparative methods to analyze the moral conflicts, sense of duty, faith, and human values portrayed through the characters of Chand Sadagar, Behula, and Lakhindar. The findings demonstrate that Manasamangal is not merely a mythological narrative; rather, it is a remarkable literary document that explores the moral, social, and philosophical dimensions of human life, making its relevance enduring even in the contemporary context.

চাবি শব্দ: মানবচিন্তা, দার্শনিক ভাবনা, নৈতিক দ্বিধা, বিশ্বাস, মানবতাবাদ, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যধারা, যা তৎকালীন সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস এবং মানুষের জীবনদর্শনের মূল্যবান দলিল হিসেবে বিবেচিত। এই ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য মনসামঙ্গল, যেখানে দেবী মনসার মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক আখ্যানের পাশাপাশি মানবজীবনের সংগ্রাম, বিশ্বাস, নৈতিক সংকট এবং দার্শনিক ভাবনার গভীর প্রকাশ ঘটেছে। ফলে কাব্যটি কেবল একটি পৌরাণিক কাহিনি নয়; বরং মানবচেতনা ও সামাজিক বাস্তবতার বহুমাত্রিক সাহিত্যিক রূপায়ণ।

মনসামঙ্গল কাব্যে ব্যক্তি ও সমাজ, বিশ্বাস ও যুক্তি, ভাগ্য ও মানবপ্রচেষ্টা, কর্তব্য ও আত্মমর্যাদার দ্বন্দ্ব বিভিন্ন চরিত্রের জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। চাঁদ সদাগরের আত্মমর্যাদা ও বিশ্বাসে অটল অবস্থান, বেহুলার ধৈর্য, ভালোবাসা ও আত্মত্যাগ এবং লখিন্দরের জীবনঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা মানবচিন্তা, নৈতিক মূল্যবোধ ও দার্শনিক অনুসন্ধানকে গভীর তাৎপর্য প্রদান করেছে। এসব চরিত্রের সিদ্ধান্ত ও সংকট কেবল ব্যক্তিগত নয়; বরং সমকালীন সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতারও প্রতিফলন।

এই প্রবন্ধে মনসামঙ্গল কাব্যে মানবচিন্তা, দার্শনিক ভাবনা ও নৈতিক দ্বিধার রূপায়ণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাব্যের চরিত্রসমূহের নৈতিক সংকট, মানবিক মূল্যবোধ এবং দার্শনিক তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। একই সঙ্গে কাব্যটির মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমকালীন প্রাসঙ্গিকতাও মূল্যায়ন করা হয়েছে। যদিও মনসামঙ্গল কাব্য নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা হয়েছে, মানবচিন্তা, দার্শনিক ভাবনা ও নৈতিক দ্বিধার সমন্বিত বিশ্লেষণ তুলনামূলকভাবে সীমিত; বর্তমান গবেষণা সেই দিকটিই অনুসন্ধান করেছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

মনসামঙ্গল কাব্যে মানবচিন্তা, নৈতিক সংকট ও দার্শনিক ভাবনার আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করা। প্রবন্ধটি কাব্যের আখ্যান, চরিত্র ও সমাজচেতনার ভেতরে নিহিত মানবিক দর্শন, নৈতিক দ্বিধা ও সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন অনুসন্ধান করে। বিশেষত এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো –

- মনসামঙ্গল কাব্যের নৈতিক ও দার্শনিক দিকগুলো উদ্ঘাটন করা।
- চরিত্রগুলোর নৈতিক সংকট, মানবচেতনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিশ্লেষণ করা।
- মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কাব্যের মানবিক মূল্যবোধ পুনর্মূল্যায়ন করা।

Department of Bangla, Pundra University of Science & Technology.
Courresponding Email: Pricila.mame@gmail.com

- অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মনসামঙ্গলের স্বাতন্ত্র্য নির্ধারণ করা।
- কাব্যের দার্শনিক চিন্তা ও নৈতিক দ্বিধাকে আধুনিক মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা।

মনসামঙ্গল কাব্যে নৈতিকতার ধারণা কেবল বাহ্যিক আচরণ নয়, বরং অভ্যন্তরীণ মানবিক চেতনার প্রকাশ। প্রবন্ধে ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও সাহিত্যতাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসরণ করে কাব্যের দার্শনিক ও নৈতিক মাত্রা নির্ণয় করা হয়েছে। বিশ্লেষণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে চরিত্রগুলোর আচরণ, মানসিক দ্বন্দ্ব এবং সিদ্ধান্তের দায়বদ্ধতার ওপর, যা মনসামঙ্গলকে শুধুমাত্র একটি প্রাচীন সাহিত্যকর্ম থেকে মানবজীবনের সার্বজনীন প্রতিচ্ছবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মনসামঙ্গল কাব্য এমন এক মানবচিন্তার দ্বার উন্মোচন করে, যেখানে নৈতিকতা, দায়বদ্ধতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণা পরস্পর যুক্ত হয়ে জটিল দার্শনিক বিন্যাস তৈরি করেছে। এই দার্শনিক ভাবনা ও নৈতিক দ্বিধার গভীরতর বিশ্লেষণ উপস্থাপন করার মাধ্যমে মধ্যযুগীয় সমাজে মানুষের আত্মপরিচয় ও মূল্যবোধের বিবর্তন স্পষ্ট হবে।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় মূলত ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, পাঠ-বিশ্লেষণ এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। কাব্যের নৈতিক ও দার্শনিক উপাদান বিশ্লেষণের জন্য ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণার পদ্ধতি তিনটি স্তরে গঠিত –

- ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ: কাব্যের রচনাকাল, সামাজিক প্রেক্ষাপট ও মধ্যযুগীয় মূল্যবোধ বিশ্লেষণ।
- পাঠ-বিশ্লেষণ: চরিত্র, প্রতীক ও আখ্যানগঠন পর্যালোচনা করে নৈতিক ও দার্শনিক ভাবনার ব্যাখ্যা।
- তুলনামূলক বিশ্লেষণ: অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে তুলনা করে মনসামঙ্গলের মানবতাবাদী স্বর নির্ধারণ।

এছাড়া কাব্যসম্ভার, পূর্ববর্তী গবেষণা এবং একাডেমিক প্রবন্ধসমূহের সাহিত্য পর্যালোচনাও এই গবেষণার সহায়ক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

ক. মনসামঙ্গলে দার্শনিক ভাবনার প্রতিফলন

এই আলোচনার শুরুতেই স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে, এই প্রবন্ধে "মানবচিন্তা" বলতে মানুষের আত্মসচেতনতা, সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়া এবং নিজের অস্তিত্ব ও নৈতিক অবস্থান সম্পর্কে তার বোধকে বোঝানো হয়েছে। একই সঙ্গে "দার্শনিক ভাবনা"কে মূলত নৈতিক দর্শন ও অস্তিত্ববাদী চিন্তার প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, ভাগ্য, কর্তব্য ও আত্মপরিচয়ের প্রশ্নগুলো কেন্দ্রীয় গুরুত্ব পায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মনসামঙ্গল কাব্যের ঘটনাপ্রবাহ কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ নয়; বরং এটি মানুষের জ্ঞান, বিশ্বাস এবং অস্তিত্বগত সংকটের এক গভীর দার্শনিক অনুসন্ধান হিসেবে প্রতিভাত হয়।

মনসামঙ্গল কাব্যে দেবী মনসা মূলত এক প্রান্তিক দেবী, যিনি লোকবিশ্বাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার কাহিনি মানুষের ভাগ্য, ভয় এবং নিয়তির সঙ্গে সংগ্রামের প্রতীকী রূপ। এই আখ্যানের মধ্য দিয়ে কাব্যটি মানবজীবনের অন্তর্গত দার্শনিক প্রশ্নগুলোকে উন্মোচিত করে।

প্রথমত, কাব্যে ভক্তি ও সংশয়ের দ্বন্দ্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক উপাদান হিসেবে উদ্ভাসিত হয়েছে। চাঁদ সদাগরের মনসা-অস্বীকৃতি কেবল ধর্মীয় প্রতিরোধ নয়; এটি নৈতিক ও বৌদ্ধিক সংকটের প্রকাশ। এখানে প্রশ্ন ওঠে-দেবতার প্রতি ভক্তি কি ভয়ের ফল, নাকি তা স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ? এই দ্বন্দ্ব মধ্যযুগীয় সমাজে মানুষের চিন্তাপদ্ধতি ও বিশ্বাসের জটিলতাকে প্রতিফলিত করে।

দ্বিতীয়ত, ভাগ্য বনাম স্বাধীন ইচ্ছার প্রশ্ন কাব্যের একটি কেন্দ্রীয় দার্শনিক স্রোত। লখিন্দরের মৃত্যুর ঘটনায় ভাগ্যের অনিবার্যতা প্রতিফলিত হলেও, বেহুলার অবিচল প্রচেষ্টা সেই ভাগ্যকে প্রতিহত করে। ফলে একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়-মানুষ কি কেবল ভাগ্যের নিয়ন্ত্রিত সত্তা, নাকি সে নিজের কর্ম ও ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে ভাগ্যকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে? এই দ্বন্দ্ব মানবজীবনের অস্তিত্ববাদী অনুসন্ধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

তৃতীয়ত, জীবনের ভয় এবং মৃত্যুর অনিবার্যতার প্রতিফলন কাব্যে প্রতীকীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সাপ এখানে কেবল প্রাকৃতিক ভয়ের প্রতীক নয়; বরং এটি মানুষের দুর্বলতা, অনিশ্চয়তা এবং মৃত্যুর অবধারিত পরিণতির রূপক। দেবী মনসার পূজার মাধ্যমে মানুষ এই ভয়কে নিয়ন্ত্রণ বা অর্থপূর্ণ করার চেষ্টা করে, যা ধর্মীয় আচার ও দার্শনিক উপলব্ধির এক সমন্বিত রূপ।

এছাড়া, কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলোর বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে নৈতিক দ্বন্দ্ব ও দার্শনিক অনুসন্ধান এর আখ্যান কাঠামোর মূল ভিত্তি। চাঁদ সদাগরের চরিত্রে বিশ্বাস বনাম যুক্তির দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট; তাঁর প্রতিরোধ ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে হলেও, তা একই সঙ্গে নৈতিক স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রকাশ। বেহুলার চরিত্রে ধৈর্য, আত্মত্যাগ ও মানবিক মূল্যবোধের এক উচ্চতর রূপ প্রতিফলিত হয়েছে, যা তাকে কেবল গার্হস্থ্য পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখে না; বরং বৃহত্তর নৈতিক ও সামাজিক প্রতীকে পরিণত করে। লখিন্দরের চরিত্রেও সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবিক অভিজ্ঞতার সূক্ষ্ম প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।
এইভাবে কাব্যে ধর্মীয় অনুশাসন, সামাজিক নিয়ম এবং ব্যক্তিগত নৈতিকতা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নৈতিক দ্বিধার এক বহুমাত্রিক চিত্র নির্মাণ করেছে। চাঁদ সদাগরের আত্মসংঘর্ষ, বেহুলার আত্মত্যাগ এবং দেবী মনসার প্রতিশোধপরায়ণতা-এসব উপাদান একত্রে মানবিক মূল্যবোধ, ন্যায় এবং কর্তব্যের জটিল সম্পর্ককে উন্মোচিত করে। মনসামঙ্গল কাব্য কেবল একটি ধর্মীয় আখ্যান নয়; এটি মানবচিন্তা, নৈতিকতা এবং অস্তিত্বগত অনুসন্ধানের এক গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক দলিল।

খ. নৈতিক দ্বিধা ও মানবিক সংকট

এই প্রবন্ধে "নৈতিক দ্বিধা" বলতে এমন এক জটিল পরিস্থিতিকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে ব্যক্তি একাধিক নৈতিক মূল্যবোধ, কর্তব্য বা সিদ্ধান্তের মধ্যে সংঘাতে পড়ে এবং কোনটি গ্রহণ করবে তা নির্ধারণ করা তার জন্য কঠিন হয়ে ওঠে। এটি কেবল ভালো ও মন্দের সরল পার্থক্য নয়; বরং একাধিক 'সঠিক' বা 'দায়বদ্ধ' বিকল্পের মধ্যে নির্বাচনজনিত সংকট। মনসামঙ্গল কাব্যে এই নৈতিক দ্বিধা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও মানসিক-তিনটি স্তরেই কার্যকর। চাঁদ সদাগরের ক্ষেত্রে এটি ব্যক্তিস্বাধীনতা বনাম সামাজিক প্রত্যাশার দ্বন্দ্ব হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে, আর বেহুলার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শোক ও সামাজিক-নৈতিক কর্তব্যের সংঘাতে তা প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে এখানে নৈতিকতা কোনো স্থির বিধান নয়; বরং এটি এক চলমান মানসিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া, যা পরিস্থিতি ও অভিজ্ঞতার আলোকে ক্রমাগত রূপান্তরিত হয়।

মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই নৈতিক দ্বিধা ও মানবিক সংকটের গভীর ও বহুমাত্রিক উপস্থাপন। চাঁদ সদাগরের চরিত্র এই দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি মনসাকে দেবী হিসেবে স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানান, কারণ তাঁর দৃষ্টিতে মনসা একজন প্রান্তিক ও অপ্রতিষ্ঠিত দেবী। কিন্তু এই অস্বীকৃতি ব্যক্তিগত বিশ্বাসের প্রকাশ হলেও এর ফলস্বরূপ পরিবার ও সমাজে বিপর্যয় নেমে আসে। এই পরিস্থিতি একটি মৌলিক নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করে-ধর্মীয় বিশ্বাস কি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষয়,নাকি তা সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত? এই নৈতিক দ্বিধা কেবল যুক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা চাঁদ সদাগরের মানসিক জগতে গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে তার আচরণ ও সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে, যা কাব্যের নিম্নোক্ত অংশে প্রতিফলিত হয়েছে –

শুন পুত্র, রাজা চন্দ্রধর।
কোথা হনে কদাচার, লক্ষ্মী নাশ করিবার,
সনকা আনিল তোর ঘর।।
দুষ্ট দেবী বিষহরী, পূর্ব জন্মে তব বৈরী,
ঘরে আইল দুষ্ট মায়া পাড়ি।
যদ্যপি চাও কল্যাণ, কর তার অপমান,
মারি দড় হেঁতালের বাড়ি।[১]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে দেখা যায়, চাঁদ সদাগরের মনোজগতে স্বপ্ন, পূর্বজন্মের বিশ্বাস এবং দেবী সম্পর্কে পূর্বধারণা একত্রিত হয়ে তার নৈতিক অবস্থানকে আরও দৃঢ় করে তোলে। এখানে নৈতিক দ্বিধা এক জটিল মানসিক প্রক্রিয়ায় রূপ নেয়, যেখানে ব্যক্তিগত বিশ্বাস, অতীত স্মৃতি এবং অদৃশ্য শক্তির প্রভাব মিলিত হয়ে সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। ফলে চাঁদের অবস্থান কেবল অহংকার নয়, বরং তার বিশ্বাসব্যবস্থার গভীর সংকট ও দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ।

ঢোল দিয়া আজ্ঞা দিল নগরে নগরে।--
যে জনে পদ্মারে পূজে দণ্ড দিব তারে।।
গাঞে গাঞে সাড়া দিয়া বলে অধিকারী।--
সর্প পাইলে যে না মারে সে আমার বৈরী।
এক গুটি সর্প মারি যে দেয় আমারে।
হাতে পায়ে তাড়-খাড়ু পরাইব তারে।।[২]

এই উদ্ধৃতিতে চাঁদ সদাগরের নৈতিক অবস্থান চূড়ান্ত রূপ লাভ করে, যেখানে তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস সামাজিক বিধানে পরিণত হয়। এখানে তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এক প্রকার কঠোর সামাজিক অবস্থানে রূপ নেয়, যা কেবল ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয়, বরং সামষ্টিক আচরণকে প্রভাবিত করে। এই অবস্থায় মানবিক সংকট আরও গভীর হয়-কারণ ব্যক্তিস্বাধীনতা, ধর্মীয় বিশ্বাস

এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ একে অপরের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়। ফলে চাঁদ সদাগরের চরিত্রে যে নৈতিক দ্বিধা শুরু হয়েছিল, তা ক্রমে এক বিস্তৃত মানবিক সংকটে পরিণত হয়, যা সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করে।

অন্যদিকে, বেহুলার চরিত্র মানবিক সংকট ও নৈতিক দৃঢ়তার এক অনন্য প্রতীক। লখিন্দরের মৃত্যুর পর তাঁর যাত্রা কেবল স্বামীর প্রতি আনুগত্যের প্রকাশ নয়; বরং এটি ব্যক্তিগত যন্ত্রণা ও সামাজিক কর্তব্যের এক গভীর সমন্বয়। তিনি ব্যক্তিগত শোককে অতিক্রম করে এমন এক নৈতিক অবস্থানে পৌঁছান, যেখানে তাঁর আত্মত্যাগ বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতীক হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়ায় তাঁর চরিত্র দেখায়-নৈতিকতা কেবল নিয়ম বা বিধান নয়, বরং তা মানবিক অভিজ্ঞতা ও মানসিক শক্তির দ্বারা গঠিত।

কাব্যে প্রতিশোধ ও ক্ষমার দ্বন্দ্ব নৈতিক জটিলতাকে আরও গভীর করে তোলে। দেবী মনসার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পথ ভয়, শাস্তি ও প্রতিশোধে পরিপূর্ণ হলেও, শেষপর্যন্ত তিনি মানুষের পূজা ও স্বীকৃতি লাভ করেন। এই দ্বৈততা একটি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক প্রশ্ন উত্থাপন করে-ক্ষমতা কি শুধুমাত্র ভয় ও দমন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, নাকি তা ন্যায়, করুণা ও মানবিকতার ভিত্তিতে স্থায়ী হয়? এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে কাব্যে মনসার প্রতিশোধপরায়ণ রূপ এবং তার কার্যকলাপের নির্মমতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যা নিম্নোক্ত ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে –

পদ্মা বোলে, "নেতা, কহ যুকতি-সন্ধান।
কি কর্ম করিলে চান্দ পুষ্প করে দান।।"
নেতা বোলে, "ডাকি আন সোহাগ নাগিনী।"
ডাক মাত্র নিকটে আইল নাগ আপনি।।
পদ্মার আদেশে নাগ চম্পকেত যায়।
রাত্রিকালে নিশাভাগে ছয় পুত্রকে খায়।।[৩]

এই ঘটনার মধ্য দিয়ে মনসার প্রতিশোধস্পৃহা চরম রূপ লাভ করে, যেখানে ব্যক্তিগত অপমানের প্রতিক্রিয়ায় তিনি নিরপরাধ সন্তানদের বিনাশ ঘটান। ফলে নৈতিকতার প্রশ্ন আরও জটিল হয়ে ওঠে-ন্যায় প্রতিষ্ঠার নামে এই ধ্বংস কতখানি ন্যায়সঙ্গত? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে কাব্য আমাদের সামনে মনসার আত্মকথন তুলে ধরে, যেখানে তার প্রতিশোধের যুক্তি ও মানসিকতা স্পষ্ট হয় –

'কানী, কানী' বলিয়া চান্দে গো নিদয়
কহিতে বাসিএ লাজ।
সেই কোপে চান্দর ছয় পুত্র খাইলাম
তবু না ছাড়এ বীরদাপ।।
সনকা রাণীর ক্রন্দন সইতে নারে,
তারে কৈলম অঙ্গীকার।
স্বর্গের অনিরুদ্ধ তার ঘরে জন্মাইব
তবে শুধিব তার ধার।।[৪]

এখানে মনসার বক্তব্যে প্রতিশোধের নৈতিকতা এক ভিন্ন মাত্রা পায়-তিনি নিজের অপমানকে ন্যায়সংগত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করতে চান। কিন্তু একইসঙ্গে ভবিষ্যতে পুনর্জন্ম ও পুনর্মিলনের ইঙ্গিত দিয়ে ক্ষমার সম্ভাবনাও রেখে দেন। এই দ্বৈততা কাব্যের নৈতিক কাঠামোকে আরও গভীর করে তোলে। এই প্রেক্ষাপটে দেবশক্তির হস্তক্ষেপ ও ভাগ্যের গতিপ্রকৃতিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যা মানবজীবনের নৈতিক সংকটকে আরও জটিল করে তোলে। এখানে দেবতাদের সক্রিয় ভূমিকা ইঙ্গিত করে যে, মানবজীবনের সংকট কেবল ব্যক্তিগত নয়; এটি এক বৃহত্তর মহাজাগতিক পরিকল্পনার অংশ। কিন্তু এই দেবীয় পরিকল্পনার মধ্যেও মানবিক প্রতিরোধ ও সংগ্রাম থেমে থাকে না, যার উজ্জ্বল উদাহরণ বেহুলার চরিত্র –

সাপের সাপুড়্যা হাতে সুবর্ণের যাঁতি।
বেহুলা ভাসিয়া যায় কোলে প্রাণপতি।।
বান্ধিয়া কালীর পুচ্ছ নেতের আঁচলে।
কলার মান্দাসে ভাসে ঢেউয়ের হিল্লোলে।[৫]

এই অংশে বেহুলার সংগ্রাম মানবিক সংকটের চূড়ান্ত রূপকে প্রকাশ করে, যেখানে দেবীর প্রতিশোধ ও মানুষের ভালোবাসা মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়ায়। বেহুলার অধ্যবসায়, সাহস ও আত্মত্যাগ কেবল ব্যক্তিগত ভালোবাসার নিদর্শন নয়; এটি দেবশক্তির বিরুদ্ধে মানবিকতার এক নীরব প্রতিরোধ। শেষপর্যন্ত মনসার কৃপা লাভের মধ্য দিয়ে এই দ্বন্দ্ব একটি সমন্বয়ের দিকে অগ্রসর হয়, যেখানে প্রতিশোধ, ক্ষমা ও করুণা একত্রিত হয়ে নৈতিকতার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ নির্মাণ করে।

মনসামঙ্গল কাব্যে নৈতিক দ্বিধা কেবল কাহিনির উপাদান নয়; বরং এটি মানবজীবনের অন্তর্গত সংকটের এক গভীর দার্শনিক প্রতিফলন, যেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং মানবিক মূল্যবোধের মধ্যে একটি জটিল ও বহুমাত্রিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

গ. দার্শনিক ও নৈতিক দিকের সমন্বয়

মনসামঙ্গল কাব্যে দার্শনিক চিন্তা ও নৈতিক দ্বিধার সমন্বয় মানবচিন্তার বহুমাত্রিক প্রকৃতিকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে। এখানে দর্শন কোনো বিমূর্ত বা তাত্ত্বিক আলোচনা নয়; বরং তা মানুষের নৈতিক সিদ্ধান্ত, সামাজিক সম্পর্ক এবং ব্যক্তিগত চেতনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

এই প্রবন্ধে আলোচিত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি মূলত তিনটি ধারার সমন্বয়ে গঠিত-নৈতিক দর্শন, মানবতাবাদ এবং অস্তিত্ববাদী অনুসন্ধান। এই তিনটি ধারার মাধ্যমে মানুষের স্বাধীনতা, দায়বদ্ধতা এবং আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি সমন্বিত দার্শনিক কাঠামো নির্মাণ করে। মনসামঙ্গল কাব্যের চরিত্রগুলো এই কাঠামোর মধ্যেই তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, ফলে কাব্যটি মানবজীবনের নৈতিক ও অস্তিত্বগত সংকটের এক গভীর সাহিত্যিক রূপ ধারণ করে।

প্রথমত, কাব্যে "ভাগ্য বনাম ইচ্ছাশক্তি" একটি কেন্দ্রীয় দার্শনিক বিষয়। লখিন্দরের মৃত্যু ভাগ্যের অনিবার্যতা নির্দেশ করলেও, বেহুলার দৃঢ়তা ও প্রচেষ্টা প্রমাণ করে যে মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও কর্ম ভাগ্যের সীমাকে প্রতিহত করতে সক্ষম। এই দ্বন্দ্ব মানবজীবনের অস্তিত্ববাদী প্রশ্নকে সামনে আনে-মানুষ কি সম্পূর্ণভাবে নিয়তির অধীন, নাকি সে নিজের জীবনগতি নির্মাণে সক্ষম?

দ্বিতীয়ত, নৈতিকতার প্রশ্নে দেখা যায় দেবী মনসার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া প্রতিশোধমূলক হলেও, শেষপর্যন্ত তা ভক্তি ও স্বীকৃতির দিকে অগ্রসর হয়। এখানে একটি মৌলিক নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়-ক্ষমতার বৈধতা কোথায় নিহিত? ভয় ও শাস্তির মধ্যে, নাকি ন্যায় ও মানবিকতার মধ্যে? এই প্রশ্নের মধ্যেই দর্শন ও নৈতিকতা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

তৃতীয়ত, কাব্যে সামাজিক দায়িত্বের দার্শনিক তাৎপর্যও গুরুত্বপূর্ণ। চাঁদ সদাগরের অস্বীকৃতি কেবল ব্যক্তিগত বিশ্বাস নয়; এটি সামাজিক অবস্থান ও আত্মপরিচয়ের প্রতিফলন। অপরদিকে, বেহুলার যাত্রা ব্যক্তিগত ভালোবাসা থেকে শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত এক বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতীকে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সার্বজনীন মানবিকতার দিকে অগ্রসর হওয়ার একটি দার্শনিক ইঙ্গিত বহন করে।

মনসামঙ্গল কাব্য দার্শনিক চিন্তা ও নৈতিক সংকটকে একত্রিত করে মানুষের জীবনের বহুমাত্রিক সত্যকে উন্মোচিত করেছে। এর ফলে কাব্যটি কেবল পৌরাণিক আখ্যান হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং নৈতিকতা, মানবতা এবং অস্তিত্বের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এক অনন্য দার্শনিক সাহিত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

- **ঐতিহাসিক পটভূমি**

বাংলা মধ্যযুগের সাহিত্যধারায় মঙ্গলকাব্য এক স্বতন্ত্র ও গৌরবময় অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। যদিও এটি মূলত দেবতার মাহাত্ম্যকথার ওপর ভিত্তি করে রচিত, তবুও এর ভেতরে ফুটে উঠেছে সমাজজীবনের বাস্তব চিত্র ও বাঙালি সংস্কৃতির নিজস্ব রূপ। বাংলা সাহিত্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাহিনিকাব্য হিসেবে মঙ্গলকাব্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। 'মঙ্গল' শব্দের মধ্যে যেমন শুভ, কল্যাণ ও আশীর্বাদের ধারণা নিহিত, তেমনি এই বিশ্বাসও বিদ্যমান ছিল যে কাব্য পাঠ বা শ্রবণ করলে অমঙ্গল দূর হয় এবং জীবনে মঙ্গল বর্ষিত হয়। ফলে মঙ্গলকাব্য কেবল ধর্মীয় আখ্যান নয়, বরং লোকবিশ্বাস, সংস্কার ও সমাজমানসের প্রতিফলনও বয়ে আনে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বহু সাহিত্য ধারার মধ্যে মঙ্গলকাব্যগুলি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। এ কাব্যগুলিতে সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির আদিম রূপ দৃশ্যমান হয়। কবিরা তৎকালীন সমাজধর্মের বাস্তবতা সাবলীলভাবে আখ্যানের মাধ্যমে তুলে এনেছেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন, "আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের যে বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্ম-বিষয়ক আখ্যানকাব্য প্রচলিত ছিল, তাহাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্যের নামে পরিচিত।"[৬]

মঙ্গলকাব্যের মূল তিনটি ধারা গড়ে উঠেছে তিন দেবতাকে কেন্দ্র করে-মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ও ধর্মমঙ্গল। এদের মধ্যে মনসা ও চণ্ডী-এই দুই স্ত্রীদেবীর কাহিনি বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরবর্তীকালে শিবমঙ্গল বা শিবায়ন নামেও একটি নতুন ধারা গড়ে ওঠে, যেখানে শিবঠাকুরকে কেন্দ্র করে মঙ্গলচেতনা প্রকাশ পায়। মঙ্গলকাব্য শুধু দেবতামাহাত্ম্যের কাব্য নয়; এটি বাংলা সমাজ, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের এক জীবন্ত দলিল, যা বাঙালির ধর্মীয় ও নৈতিক মানসগঠনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য ধারার অন্যতম প্রধান কাব্য। এই ধারার অপর দুই প্রধান কাব্য-চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল-এর তুলনায় মনসামঙ্গল প্রাচীনতর। কাব্যের আদি কবি কানাহরি দত্ত সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীর

শেষ বা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। অনুমিত হয়, মনসামঙ্গল কাব্যের উৎপত্তি পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে। পরে পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গেও এই কাব্যের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষ্য প্রাসঙ্গিক: "বাংলা দেশের নানা অঞ্চলে বহু মনসামঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়েছে, তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে কাব্যগুলো 'মনসামঙ্গল' ও পূর্ববঙ্গে প্রায়শই 'পদ্মাপুরাণ' নামে পরিচিত।"[৭]

বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের সময়ে সমাজ প্রধানত কৃষিনির্ভর ও গ্রামীণ জীবনকেন্দ্রিক ছিল। সেই সময়ের সাহিত্য, সংগীত ও চিত্রকলায় গ্রামীণ জীবনের প্রভাব স্পষ্ট। মানুষ তখন প্রকৃতি, পরিবার ও সমাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত ছিল; জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হতো সামাজিক নিয়ম, পারিবারিক মূল্যবোধ ও সামষ্টিক বিশ্বাস দ্বারা। মনসামঙ্গল কাব্য সেই সময়ের সাহিত্যচর্চার ফল, যেখানে মানুষ ও সমাজের সম্পর্ক কেবল ধর্মীয় বিশ্বাসের মাধ্যমে নয়, বরং নৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার আকারে প্রকাশ পেয়েছে। চরিত্র চাঁদ সদাগর, বেহুলা ও লখিন্দরের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগীয় সমাজের বাস্তব মানুষের চিন্তাভাবনা ও আচরণের প্রতিফলন ঘটেছে; এদের দ্বন্দ্ব সমাজের মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও মানবচেতনার জটিলতা প্রকাশ করে।

মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু চারটি ধারা বা অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ বন্দনা, যেখানে বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা করা হয়। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ধর্মীয় দেবতাদেরই নয়, সব শ্রেণির উপাস্যদেরও প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, যা মঙ্গলকাব্য রচয়িতাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিফলন। দ্বিতীয় অংশে কবির আত্মপরিচয় ও গ্রন্থ রচনার কারণ-স্বপ্নাদেশ বা দৈবনির্দেশ-বর্ণিত। তৃতীয় অংশ দেবখন্ড, যেখানে পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে লৌকিক দেবতার সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, বিশেষভাবে শিবের প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়। চতুর্থ অংশ নরখন্ড ও আখ্যায়িকা, যা মূলত পূজাপ্রচারের উদ্দেশ্যে শাপভ্রষ্ট কোনো দেবতা বা স্বর্গবাসীর নরজীবন, নররূপে কর্মকান্ড এবং মানব সমাজে পূজা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া বর্ণনা করে। এ অংশে নায়িকাদের বারমাস্যা, চৌতিশা, সাজ-সজ্জা, রন্ধনপ্রণালী ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত থাকে। সামাজিক ও সাহিত্যিক কাঠামোর পেছনে যে ঐতিহাসিক বাস্তবতা ক্রিয়াশীল ছিল, তা আরও স্পষ্টভাবে অনুধাবনের জন্য তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

> মঙ্গলকাব্যের উদ্ভবের সঙ্গে তখনকার রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রসঙ্গের একটা সম্পর্ক ছিল বলে মনে করা হয়। বাংলায় তুর্কি-আক্রমণ হয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের সন্ধিক্ষণে সেন-রাজত্বের সময়। স্বল্প শক্তি নিয়ে বখতিয়ার খলজী লক্ষণসেনকে পরাজিত করে বাংলা দখল করেন। এই লঘু শক্তির কাছে কেন সেন রাজারা পরাজিত হলেন তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, হয়তো ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক সেন রাজাদের প্রতি স্বল্প সংখ্যক উচ্চবর্ণের লোকদেরই সমর্থন ছিল; কিন্তু অবহেলা, উপেক্ষা ও অত্যাচারের কারণে নিম্নবর্ণের হিন্দু প্রজাসাধারণের কোনো সমর্থন তাঁদের প্রতি ছিল না। তাই বৈদেশিক আক্রমণের সময় তারা রাজার সাহায্যে এগিয়ে যায়নি। আর পূর্বে ক্ষমতাচ্যুত বৌদ্ধরা হয়তো সেনদের বিরুদ্ধে আক্রমণকারীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতাই করে থাকবে।[৮]

মনসামঙ্গল কাব্য বাংলা মঙ্গলকাব্য ধারার একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়। চণ্ডীমঙ্গল বা ধর্মমঙ্গলের তুলনায় এখানে মানবজীবনের বাস্তবতা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বেশি প্রখরভাবে প্রকাশিত। চণ্ডীমঙ্গল মূলত সমাজসংগঠনের নৈতিক প্রয়োজনের উপর কেন্দ্রীভূত, যেখানে মনসামঙ্গল ব্যক্তিগত নৈতিক সংকট ও মানবচিন্তার গভীরতা অনুসন্ধান করে। কাব্যটি মধ্যযুগীয় সমাজের অর্থনৈতিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোকে সাহিত্যিক ভাষায় তুলে ধরেছে। ভাষা, বর্ণনা ও প্রতীকতত্ত্বের মাধ্যমে বোঝা যায়- মানুষের জীবন ও সংগ্রাম কেবল পার্থিব নয়, বরং আত্মিক ও দার্শনিক অনুসন্ধানেরও প্রতিফলন। এই সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য ও মঙ্গলকাব্য ধারার প্রকৃতি সম্পর্কে সমালোচকদের মূল্যায়ন নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে –

> মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনায় মঙ্গলকাব্য নামে এক ধরনের প্রাচীন বাংলা কাব্যকে পৃথক শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। এই শ্রেণীর মধ্যে তিন রকমের কাব্য-কাহিনী প্রধান :- (১) পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, (২) মঙ্গলচণ্ডীর গীত বা চণ্ডীমঙ্গল এবং (৩) ধর্মমঙ্গল। বিভিন্ন দেবতা এবং বিচিত্র রকমের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে এই সব কাব্য গড়ে উঠেছে। তবু, এদের যে একই নামের বন্ধনে বাঁধা হয়ে থাকে, তার প্রধান কারণ দুটি। - প্রথমতঃ এই সব কাব্যের উদ্ভব হয়েছে সমাজের একই অনভিজাত স্তর থেকে ; দ্বিতীয়, এদের বাহ্য রূপাঙ্গিকেও একটা মোটামুটি সাদৃশ্য রয়েছে।[৯]

মধ্যপর্যায়ের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সমাজের উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির চিন্তা,অনুভূতি ও কল্পনার মধ্যে একটি সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা। এই সাহিত্য শ্রেণিভেদ অতিক্রম করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবন, বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে একসূত্রে আবদ্ধ করেছে। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রচার ও প্রকাশনার ইতিহাসেও এই সর্বজনগ্রাহ্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। গবেষকদের মতে, কেতকাদাসের মনসামঙ্গল সর্বপ্রথম মুদ্রিত হওয়ার পর সুলভ মূল্যের ছাপাখানার

উদ্যোগে এর বহু সংস্করণ সমগ্র বাংলায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। পরবর্তীকালে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ববঙ্গে গৃহপাঠের জন্য ব্যবহৃত মনসামঙ্গল-এর পুঁথিও মুদ্রিত হতে শুরু করে এবং কলকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন অঞ্চলে এর প্রকাশ ও প্রসার লাভ করে। বিভিন্ন প্রকাশক একাধিক কবির রচনাসংবলিত সংস্করণ প্রকাশের ক্ষেত্রে "ষষ্ঠ কবি" বা "বাইশ কবি" প্রভৃতি নাম ব্যবহার করে পৃথক সংস্করণের পরিচয় নির্ধারণ করলেও, এগুলো কোনো বিশেষ সাহিত্যিক মর্যাদার নির্দেশক ছিল না; বরং প্রচলিত সংস্করণগুলোর মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করার একটি প্রকাশনাগত কৌশল ছিল।

মধ্যযুগীয় বাংলার সমাজ কৃষিনির্ভর হওয়া সত্ত্বেও ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যচর্চার প্রভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। বণিক শ্রেণি, যেমন চাঁদ সদাগর, সেই সময়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রতীক। তাঁর চরিত্রে দেখা যায় আত্মসম্মান, নৈতিকতা ও সামাজিক অবস্থান রক্ষার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। সাধারণ মানুষের জীবনে প্রকৃতি ও ভাগ্যের প্রভাব গভীর ছিল। জীবনের অনিশ্চয়তা ও সামাজিক নিয়মের ভারসাম্য রক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেকে চিহ্নিত করত। মনসামঙ্গল কাব্য সেই মানবিক অনুসন্ধানের সাহিত্যিক রূপ, যেখানে মানুষ ভাগ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজের নৈতিক অবস্থান নির্ধারণের চেষ্টা করে।

মনসামঙ্গল একটি আখ্যানকাব্য। এই কাব্যের প্রধান আখ্যানটিও আবর্তিত হয়েছে মর্ত্যলোকে মনসার নিজ পূজা প্রচারের প্রয়াসকে কেন্দ্র করে। কাব্যের মূল উপজীব্য চাঁদ সদাগরের উপর দেবী মনসার অত্যাচার, চাঁদের পুত্র লখিন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু ও পুত্রবধূ বেহুলার আত্মত্যাগের উপাখ্যান। এই কাব্যে সেযুগের হিন্দু বাঙালি সমাজের সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে নানা অনপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগর শুধুমাত্র এই কাব্যেরই নয়, বরং সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বলিষ্ঠ চরিত্র; বেহুলা-লখিন্দরের করুণ উপাখ্যানটিও তার মানবিক আবেদনের কারণে আজও বাঙালি সমাজে জনপ্রিয়।

মনসামঙ্গল কাব্য মধ্যযুগীয় সমাজের একটি সংযোগ বিন্দু, যেখানে প্রথাগত বিশ্বাসের পাশাপাশি নতুন নৈতিক ধারণার উন্মেষ ঘটেছে। সমাজ ধীরে ধীরে এক মূল্যবোধ থেকে অন্য মূল্যবোধে রূপান্তরিত হচ্ছিল-এই সময়ে কাব্য মানুষকে তার অস্তিত্ব, দায়বদ্ধতা ও নৈতিকতার প্রশ্নে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করেছিল। যে মানবিক বোধ কাব্যে ফুটে উঠেছে তা যুগ-নির্দিষ্ট নয়; এটি সার্বজনীন। সমাজ যতই পরিবর্তিত হোক, মানুষের অভ্যন্তরীণ নৈতিক দ্বন্দ্ব, আত্মসম্মান ও মানবিক সম্পর্কের জটিলতা আজও প্রাসঙ্গিক। অতএব, মনসামঙ্গল কাব্য কেবল ঐতিহাসিক দলিল নয়, বরং সমাজ-মানবতার একটি কালজয়ী প্রতিফলন।

- **মানবজীবনের দর্শন ও অস্তিত্বের অনুসন্ধান**

চাঁদ সদাগর মনসামঙ্গল কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র, যার জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্ত নৈতিকতা, কর্তব্যবোধ এবং আত্মসম্মানের দার্শনিক সংঘাতে আবদ্ধ। তিনি কেবল একজন বণিক নন; তিনি মধ্যযুগীয় সমাজে মানবচেতনার এক প্রতীক। তাঁর ব্যবসায়িক স্বার্থ, পারিবারিক দায়িত্ব ও নৈতিক অবস্থানের মধ্যে যে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়, তা কাব্যের নৈতিক দ্বিধার মূল উৎস। তাঁর নৈতিক সিদ্ধান্ত কখনো ব্যক্তিগত সংকটের প্রকাশ, আবার কখনো সমাজের দায়বদ্ধতা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন। সমাজে তাঁর অবস্থান, সম্পর্ক ও সম্মান-সবই তাঁর নৈতিক স্থিতি ও দৃঢ়তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত।
চাঁদ সদাগরের চরিত্র দুঃসাহস, আত্মসম্মান ও নৈতিক দৃঢ়তার এক উজ্জ্বল প্রতীক। তিনি আপসহীন-"ভাঙবেন, তবু নত হবেন না।" তাঁর সমগ্র জীবন এই পৌরুষ, তেজ ও বিশ্বাসের দীপ্ত প্রতিফলন। মধ্যযুগের সামাজিক অন্ধকারে তিনি যেন এক আলোকরশ্মি, যিনি দেবতা বা ভাগ্যের প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ না করে নিজের বিশ্বাস ও সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন। সেই সময়ে যখন দেবতা ও ভাগ্য মানবজীবনের নিয়ন্ত্রক বলে বিবেচিত হতো, তখন চাঁদ সদাগরের মতো এক মানুষ দেবী মনসার আরাধনা প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে মানবিক বোধ ও আত্মসম্মানের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন-এটি তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও দার্শনিক সাহসের প্রতিফলন।

এই চরিত্র আমাদের শেখায়-নৈতিকতা কোনো বাহ্যিক বিধান নয়, বরং অন্তরের দৃঢ়তা ও মানবিক সচেতনতায় গঠিত এক বিশ্বাসব্যবস্থা। চাঁদ সদাগরের এই অটল আত্মমর্যাদাবোধ কেবল তাঁর ব্যক্তিগত গুণ নয়; এটি এক সমগ্র যুগের মানবচেতনার প্রতীক, যেখানে মানুষ ভাগ্য বা দেবশক্তির অধীন থেকে মুক্ত হয়ে নিজের নৈতিক শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। তাঁর চরিত্রে ফুটে উঠেছে এক আদর্শ মানবের প্রতিমূর্তি-যিনি ভাঙতে জানেন, কিন্তু নত হতে জানেন না।

বহুযুগের সমাজমানসে চাঁদ সদাগর এক আদর্শ পুরুষের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও তিনি কোনোভাবেই নিস্প্রাণ আদর্শচিত্র নন। বরং তৎকালীন সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে তিনি এক বহুমাত্রিক চরিত্র-স্বামী, পিতা ও শ্বশুর হিসেবে তিনি কর্তব্যপরায়ণ, দায়িত্বশীল এবং মানবিক গুণাবলীতে সমৃদ্ধ। তাঁর বিবেকবোধ, স্নেহ, প্রেম, দয়া ও সামাজিক দায়িত্ববোধ তাকে একটি জীবন্ত ও বাস্তব মানবচরিত্রে পরিণত করেছে।

তবে এই সমস্ত মানবিক গুণাবলি ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমাজমানসের বৃহত্তর প্রয়োজনে তা পরিচালিত হয়েছে। বিশেষত অত্যাচারী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং নিজের নৈতিক অবস্থান অটুট রাখা-এই চেতনা তাঁর চরিত্রের কেন্দ্রে অবস্থান করে। মনসামঙ্গল কাব্যের মূল কাহিনিও এই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে, যেখানে দেবী মনসা চাঁদ সদাগরকে বশীভূত করে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালান। প্রথমে কৌশল অবলম্বন করে এবং মহাদেবের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য আদায়ের চেষ্টা করা হলেও, চাঁদ সদাগরের দৃঢ় মনোভাব সেই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়। এই প্রত্যাখ্যান ও প্রতিরোধের তীব্রতা তাঁর ভাষা ও আচরণের মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যা নিম্নোক্ত পংক্তিগুলোতে প্রকাশ পায় –

লাজ নাই পদ্মার এমত বোলে বাণী।
শিবের ভক্তের হাতে চাহে ফলপাণি।।
স্বামী এ ছাড়িল যাকে দেখি অনাচার
হেন জনা পুজিবার ইচ্ছা আছে কার।। [১০]

তৎকালীন শাসকশক্তির প্রতীক হিসেবে মনসাও কোনোভাবেই নতি স্বীকার করেন না। তিনি চাঁদ সদাগরকে নির্ধন ও নির্বংশ করার ভয়াবহ হুমকি প্রদান করেন, যা তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার কৌশলকে নির্দেশ করে। কিন্তু চাঁদ সদাগরের চরিত্রে যে দৃঢ়তা ও অপরাজেয় মানসিক শক্তি লক্ষ করা যায়, তা তাকে এই ভয় প্রদর্শনের কাছে অবনত হতে দেয় না। বরং তিনি নিজের অবস্থানে অবিচল থেকে কেবল ব্যক্তিগতভাবে নয়, সামষ্টিক স্তরেও মনসার পূজা প্রতিরোধের ঘোষণা দেন। এই অটল প্রতিজ্ঞা তাঁর নৈতিক দৃঢ়তা ও আত্মমর্যাদাবোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যা নিম্নোক্ত পঙ্ক্তিগুলিতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে –

চান্দোএ বোলেন বাণী সহায় শূল পাণি
কি ডর তোর অঙ্গীকারে।
প্রতিজ্ঞা শুনেহ মোর সংসারের মধ্যে তোর
নাই দিব পূজা করিবারে।। [১১]

চাঁদ সদাগরের এই অবস্থান কেবল ক্ষণিকের ক্রোধ বা আবেগপ্রসূত প্রতিক্রিয়া নয়; বরং এটি তাঁর গভীর নৈতিক বিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধের বহিঃপ্রকাশ। তিনি সমগ্র সত্তা দিয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই দৃঢ়তা এমন এক মানসিক অবস্থার নির্দেশ করে, যেখানে ব্যক্তি সামাজিক ও ধর্মীয় চাপ সত্ত্বেও নিজের নৈতিক অবস্থান থেকে বিচ্যুত হতে অস্বীকার করে। দেবী মনসাও এই প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতন এবং নিজেই শিবের কাছে চাঁদ সদাগরের এই অহং ও অবাধ্যতার কথা ব্যক্ত করেন। এই প্রেক্ষাপটটি কাব্যে নিম্নোক্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে –

শুন বাপ করি নিবেদন।
চান্দ বেটা দুরাচার অতি করে অহঙ্কার
মোরে মন্দ বলিল বিস্তর।
যেবা মোর পূজা করে তাহারে আনিয়া মারে
মোরে বলে লঘু জাতি কাণী। [১২]

মনসামঙ্গল কাব্য সমাজ ও মানুষের জীবনচিন্তার প্রতিফলন। এখানে মানুষ কেবল ভাগ্যনির্ভর নয়; সে নিজের সিদ্ধান্ত ও বিশ্বাসের মাধ্যমে জীবনের কাঠামো গঠন করে। চাঁদ সদাগরের চরিত্রে অহং ও দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে, যা মানুষের কর্তব্য ও আত্মসম্মানের দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তোলে। চাঁদ নিজের নৈতিক অবস্থান বজায় রেখে যে দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন, তা তাঁর অস্তিত্বচেতনার বহিঃপ্রকাশ।

অপরদিকে বেহুলার চরিত্র মানবজীবনের স্থিতিশীলতা ও আত্মত্যাগের দর্শন প্রতিফলিত করে। তিনি মানবিক ধৈর্য, বিশ্বাস ও জীবনের পুনরুদ্ধারের প্রতীক। বেহুলার যাত্রা কেবল স্বামীর জন্য নয়, বরং মানবতার আশাবাদ ও অবিচলতার প্রতীক। এই দুই চরিত্রের মানসিক শক্তি ও নৈতিক সিদ্ধান্ত মানবজীবনের অস্তিত্ববাদী প্রশ্নের প্রতিফলন-মানুষ কীভাবে প্রতিকূলতার মধ্যে নিজের অর্থ ও লক্ষ্য খুঁজে পায়।

মনসামঙ্গলে ভাগ্য ও মানবপ্রচেষ্টার দ্বন্দ্ব প্রধান দার্শনিক স্রোত। মানুষ একদিকে ভাগ্যের অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অন্যদিকে নিজের প্রচেষ্টায় সেই ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে চায়। এই দ্বন্দ্ব মানুষের চিরন্তন অস্তিত্ব সংকটের প্রতীক। চাঁদ সদাগর বিশ্বাস করেন যে তাঁর কর্তব্য ও নৈতিক অবস্থানই জীবনের মূল ভিত্তি। অন্যদিকে বেহুলা প্রমাণ করেন যে মানবপ্রচেষ্টা ও ভালোবাসা ভাগ্যের সীমা অতিক্রম করতে পারে। এই মিলন এক গভীর দার্শনিক উপলব্ধি দেয়- মানুষের জীবন ভাগ্যের খেলা হলেও তার নৈতিক সাহস ও আত্মসংযম জীবনকে অর্থবহ করে তোলে।

চরিত্ররা কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, বরং সমাজ ও সম্পর্কের দায়বদ্ধতার মধ্যে দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। চাঁদ সদাগরের নৈতিকতা ব্যক্তিগত অহংবোধে আবদ্ধ হলেও তার মধ্যে রয়েছে গভীর কর্তব্যচেতনা–নিজেকে নৈতিকভাবে দৃঢ় রাখার আকাঙ্ক্ষা। বেহুলার কর্তব্যচেতনা ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে মানবিক নৈতিকতার উচ্চতর রূপ প্রকাশ করে। এই দুটি অবস্থান মানবজীবনের নৈতিক দ্বন্দ্বকে দার্শনিকভাবে উন্মোচন করে। কাব্যে নৈতিকতা কোনো বাহ্যিক বিধান নয়, বরং মানুষের অভ্যন্তরীণ বিবেকের প্রকাশ। পরিস্থিতি ও মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতার ওপর নির্ভর করে ভালো-মন্দ, কর্তব্য-স্বার্থ, সত্য-অসত্যের পার্থক্য।

মনসামঙ্গল কাব্যের প্রতিটি স্তরে মানুষের আত্মপরিচয় খোঁজার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বেহুলার যাত্রা স্বামীর জীবনের জন্য নয়, বরং নিজের আত্মপরিচয়ের পুনর্নির্মাণের প্রতীক। তাঁর ধৈর্য, দৃঢ়তা ও মানবিক সাহস দেখায় যে জীবনের অর্থ শুধুমাত্র বেঁচে থাকা নয়, বরং নৈতিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকা। চাঁদ সদাগরও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে নৈতিক বিশ্বাসের মাধ্যমে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তার চরিত্র মানবচেতনার দ্বন্দ্ব ও আত্মসম্মানের প্রতিফলন। কাব্যের এই দিক এটিকে দার্শনিকভাবে উচ্চ মানের সাহিত্যকর্মে রূপান্তরিত করেছে, যেখানে মানুষ নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিচারক।

মনসামঙ্গল কাব্যের দার্শনিক বোধ মানুষের আত্মসচেতনতা, নৈতিক দায়বদ্ধতা ও অস্তিত্ববোধের সংমিশ্রণ। ভাগ্য কোনো স্থির শক্তি নয়, বরং মানুষের মানসিকতার প্রতীক। যখন মানুষ সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে নৈতিক ও ভালোবাসাভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন জীবনের অর্থ স্পষ্ট হয়। এভাবে মনসামঙ্গল কাব্য এক মানবদর্শনের কাব্য-যেখানে জীবন, নৈতিকতা ও কর্তব্য একই সূত্রে বাঁধা। এটি মানুষের আত্ম-অস্তিত্বের দর্শন প্রকাশ করে এমন একটি সাহিত্যকর্ম, যা আজও সমান প্রাসঙ্গিক ও মূল্যবান।

কাব্যের নৈতিক সংকট শুধুমাত্র চরিত্রগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। চাঁদ সদাগরের ব্যবসায়িক ও পারিবারিক সিদ্ধান্ত, বেহুলার আত্মত্যাগ-সবই সমাজের কাঠামো ও মানসিকতায় প্রভাব ফেলে। এই প্রেক্ষাপট কাব্যকে নৈতিকতার সামাজিক দিক উন্মোচন করে দেখায় যে, নৈতিকতা কেবল ব্যক্তিগত চেতনার ফল নয়, বরং মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব ও সম্পর্কের প্রতিফলন। কাব্যের নৈতিক দ্বিধা তিনটি স্তরে বিশ্লেষণ করা যায়:

১. অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব - ব্যক্তির নিজের চেতনা ও ইচ্ছার মধ্যে সংঘাত।
২. সামাজিক দ্বন্দ্ব - ব্যক্তিগত কর্তব্য বনাম সমাজের প্রত্যাশা।
৩. মৌলিক নৈতিক দ্বন্দ্ব - ভালো-মন্দ, সত্য-অসত্য ও কর্তব্য-স্বার্থের মধ্যে আপেক্ষিক সংঘাত।

চরিত্ররা যখন নৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তারা একদিকে নিজেদের অস্তিত্ব, অন্যদিকে সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। এভাবেই কাব্য নৈতিক দ্বিধাকে কেবল গল্পের উপাদান হিসেবে নয়, বরং মানবজীবনের অন্তর্গত সংকটের দার্শনিক প্রতিফলন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

- চাঁদ সদাগর ও বেহুলার নৈতিক দ্বিধা কাব্যের কেন্দ্রীয় দিক।
- ব্যক্তিগত ইচ্ছা, সামাজিক প্রত্যাশা ও মানবিক দায়িত্বের মধ্যে সংঘাত মানসিক ও সামাজিক সংকট তৈরি করে।
- নৈতিক সিদ্ধান্তের প্রভাব কেবল ব্যক্তিগত নয়; এটি সমাজের কাঠামো ও মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।
- কাব্য দার্শনিকভাবে নির্দেশ করে, নৈতিকতা ও মানবিক সিদ্ধান্ত সবসময় সংকটপূর্ণ ও জটিল এবং জীবনের অর্থ ও সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য অপরিহার্য।

মনসামঙ্গল কাব্য মধ্যযুগীয় বাংলার নৈতিক, সামাজিক ও দার্শনিক চেতনার এক অনন্য প্রতিফলন। তবে কেবল এককভাবে এর বিশ্লেষণ করলে কাব্যের সার্বজনীন তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হয় না। বিশেষত, এই প্রবন্ধে আলোচিত নৈতিক দ্বন্দ্ব, মানবচেতনা ও সামাজিক প্রতিরোধের দিকগুলোকে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবনের জন্য মনসামঙ্গলকে বাংলা মঙ্গলকাব্যের বৃহত্তর ধারার মধ্যে স্থাপন করে বিচার করা প্রয়োজন। এই কারণেই অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে তুলনামূলক বিশ্লেষণ কাব্যটির স্বাতন্ত্র্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অ. নৈতিক দ্বিধা ও মানবিক সংকট

মনসামঙ্গল কাব্যে "নৈতিক দ্বিধা" বোঝায় এমন পরিস্থিতি, যেখানে চরিত্র একাধিক নৈতিক মূল্যবোধ, কর্তব্য বা সিদ্ধান্তের মধ্যে সংঘাতের সম্মুখীন হয়। এটি শুধু ভালো-মন্দের সরল পার্থক্য নয়; বরং একাধিক 'সঠিক' বা 'দায়বদ্ধ' বিকল্পের মধ্যে মানসিক ও নৈতিক দ্বন্দ্ব। চাঁদ সদাগরের ক্ষেত্রে দ্বিধা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বনাম সামাজিক প্রত্যাশার মধ্যে দেখা যায়। তিনি দেবী মনসাকে প্রাথমিকভাবে স্বীকার করেন না, যা পরিবার ও সমাজের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে।

বেহুলার চরিত্র মানবিক সংকটের আরেকটি প্রধান উদাহরণ। লখিন্দরের মৃত্যুর পর তার যাত্রা ব্যক্তিগত শোক ও সামাজিক কর্তব্যের সংমিশ্রণ। তার ধৈর্য, সাহস ও আত্মত্যাগ কেবল স্ত্রীত্ব বা পারিবারিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি

মানবিক দায়বদ্ধতার এক সমগ্র প্রতীক, যেখানে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, সামাজিক প্রত্যাশা এবং নৈতিক মূল্যবোধ একত্রিত হয়। দেবী মনসার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াও প্রতিশোধ ও ন্যায়ের দ্বন্দ্বের মাধ্যমে নৈতিক জটিলতা তৈরি করে। এই বিশ্লেষণ প্রমাণ করে, নৈতিকতা কোনো স্থির বিধান নয়; এটি সমাজ, মনস্তত্ত্ব এবং ব্যক্তিগত বিবেকের চলমান প্রক্রিয়ার ফলাফল।

আ. সামাজিক কাঠামো ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব

মনসামঙ্গল কাব্য চরিত্র এবং সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটায়। মধ্যযুগীয় বাংলার সমাজ পেশা, পরিবার ও শ্রেণি ভিত্তিক ছিল। চাঁদ সদাগর একজন ধনকুবের বণিক এবং সমাজে প্রভাবশালী ব্যক্তি; তার প্রতিটি নৈতিক সিদ্ধান্ত কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়, সমাজের নিয়ম, সম্মান ও সম্পর্কের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তার ব্যবসায়িক ও সামাজিক অবস্থান, পরিবারের প্রত্যাশা এবং আত্মসম্মান-সব একত্রিত হয়ে নৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে।

বেহুলার চরিত্রে দেখা যায় কাব্য কীভাবে মানসিক চাপ, ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং সামাজিক প্রত্যাশা নৈতিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে সংযুক্ত করে। লখিন্দরের মৃত্যু এবং বেহুলার পরবর্তী যাত্রায় ভাগ্য,ভয়,বিশ্বাস এবং দায়বদ্ধতার মধ্যে গভীর দার্শনিক সংযোগ প্রতিফলিত হয়েছে। এটি মানব জীবনের নৈতিক ও অস্তিত্বগত সংকটকে জীবন্তভাবে উপস্থাপন করে এবং চরিত্রগুলোর মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া দর্শকের কাছে স্পষ্ট করে।

ই. তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও সার্বজনীন প্রাসঙ্গিকতা

বাংলা মঙ্গলকাব্যের মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল এবং মনসামঙ্গল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গবেষণায় মনসামঙ্গল কাব্যের মূল উৎস হিসেবে বিজয়গুপ্তের রচনাকে গ্রহণ করা হয়েছে। তুলনামূলক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রাসঙ্গিক রূপ ও বিষয়বস্তুকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেবতা ও সমাজের সম্পর্ক প্রধানত বাহ্যিক নিয়ম ও ধর্মীয় কাঠামোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই উৎসগুলোর আলোকে মনসামঙ্গল কাব্যের নৈতিক, মানবিক ও দার্শনিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে, কিভাবে এটি অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যকার নৈতিক দ্বন্দ্বকে স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভাসিত করে। এই কাব্যগুলো মূলত দেবতার কর্ম এবং সমাজের নৈতিক কাঠামোর ওপর কেন্দ্রীভূত। চরিত্ররা প্রায়শই বাহ্যিক বিধান-দেবতার আদেশ, ধর্মীয় নিয়ম বা সমাজের প্রত্যাশা-অনুসরণ করে। তুলনায় মনসামঙ্গল কাব্য নৈতিক দ্বিধা, মানবিক সংকট এবং ব্যক্তিগত চেতনার ওপর গভীর মনোনিবেশ করেছে।

মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগর ও বেহুলার দ্বন্দ্ব দেখায় কিভাবে মানবচেতনা, বিশ্বাস, ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা এবং সামাজিক চাপ একত্রিত হয়ে নৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। এটি তুলনামূলকভাবে অন্য মঙ্গলকাব্যের চেয়ে দার্শনিক ও মানবিক গভীরতা বহুগুণ বাড়ায়। উদাহরণস্বরূপঃ চণ্ডীমঙ্গলে চরিত্ররা সমাজ ও দেবতার আদেশ মেনে চলে, নৈতিক দ্বিধা প্রায়শই বাহ্যিক। ধর্মমঙ্গলে নৈতিক সিদ্ধান্ত সামাজিক নিয়ম ও ধর্মীয় কর্তব্যের আলোকে গঠিত। মনসামঙ্গলে, চাঁদ সদাগর ও বেহুলার নৈতিক দ্বন্দ্ব অভ্যন্তরীণ বিবেক এবং মানবচেতনার ফল, যা কাব্যকে দার্শনিকভাবে সমৃদ্ধ করে।

সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রভাবের এই সংমিশ্রণ কাব্যকে এক চিরন্তন মানবিক দলিল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এটি দেখায় যে সমাজ ও ব্যক্তি আলাদা নয়; তারা পরস্পরের সঙ্গে ক্রমাগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় যুক্ত। সামাজিক কাঠামো, পেশা, পরিবার ও সংস্কৃতি চরিত্রগুলোর নৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে, কিন্তু চরিত্রের অভ্যন্তরীণ বিবেকও সমাজকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। ফলে মনসামঙ্গল কাব্য নৈতিক, মানবিক এবং দার্শনিক অনুসন্ধানের এক অনন্য সাহিত্যকর্ম।

উপসংহার

আলোচনার ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, মনসামঙ্গল কাব্য মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাব্য, যেখানে মানবচিন্তা, দার্শনিক ভাবনা এবং নৈতিক দ্বিধার বহুমাত্রিক প্রকাশ ঘটেছে। কাব্যের চরিত্রসমূহের জীবনসংগ্রাম, বিশ্বাস, কর্তব্যবোধ, আত্মমর্যাদা এবং মানবিক মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজের জটিল সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষত চাঁদ সদাগর, বেহুলা ও লখিন্দরের চরিত্র মানবজীবনের নৈতিক সংকট, সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বন্দ্ব এবং অস্তিত্ববোধকে গভীর তাৎপর্যের সঙ্গে উপস্থাপন করেছে।

গবেষণায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে, মনসামঙ্গল কাব্য কেবল ধর্মীয় বা পৌরাণিক আখ্যান নয়; বরং এটি মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ, দার্শনিক অনুসন্ধান এবং মানবিক চেতনার এক সমৃদ্ধ সাহিত্যিক দলিল। কাব্যটি ভাগ্য ও মানবপ্রচেষ্টা, বিশ্বাস ও যুক্তি, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সামাজিক দায়বদ্ধতার পারস্পরিক সম্পর্ককে এমনভাবে রূপায়িত করেছে, যা মধ্যযুগীয় সমাজের বাস্তবতার পাশাপাশি সমকালীন জীবনবোধের সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

অতএব, মনসামঙ্গল কাব্যে মানবচিন্তা, দার্শনিক ভাবনা ও নৈতিক দ্বিধার বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, এই কাব্যের তাৎপর্য কেবল সাহিত্যিক নয়; এটি মানবজীবনের নৈতিক ও দার্শনিক অন্বেষণেরও এক অনন্য দলিল। মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিক

সিদ্ধান্ত এবং আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে কাব্যটির শিক্ষা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক, যা বাংলা সাহিত্যে মনসামঙ্গল-এর চিরন্তন গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে।

তথ্য নির্দেশক

[১] আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা* (কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৪), পৃ.৮০।

[২] প্রাগুপ্ত, পৃ.৮০।

[৩] প্রাগুপ্ত, পৃ.৮৬।

[৪] প্রাগুপ্ত, পৃ.১৩৪।

[৫] প্রাগুপ্ত, পৃ.২১৩।

[৬] অরূপ চক্রবর্তী, "রূপগঠনতাত্ত্বিক পর্যালোচনার আলোকে মনসামঙ্গল কাব্য", *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)* A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 03 Website: https://tirj.org.in, Page No. 18 - 42 Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue .

[৭] https://bn.wikipedia.org/wiki

[৮] https://bn.banglapedia.org/index.php

[৯] শ্রী ভূদেব চৌধুরী, *বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (কলকাতা: দেশ পাবলিশিং, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৪।

[১০] জয়া সেনগুপ্তা, *মনসামঙ্গল কাব্যের সামাজিক পটভূমিকা ও নারী* (ঢাকা: বড়াল প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০), পৃ. ২১৮।

[১১] প্রাগুপ্ত, পৃ.২১৯।

[১২] প্রাগুপ্ত, পৃ.২১৯।

গ্রন্থপঞ্জি

[১] আশুতোষ, ভট্টাচার্য। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*। কলকাতা: রাজীব নিয়োগী, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা: লি: ১৯৮৯।

[২] সেন, সুকুমার। *বাঙালা সাহিত্যের ইতিহাস (২ খণ্ড)*। কলকাতা, শ্রী উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৩৪৭।

[৩] সেন, ক্ষিতিমোহন। *বাংলায় মনসা পূজা*। প্রথম প্রকাশ প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৯।

[৪] চ্যাটার্জী, কুমকুম। *বাংলার মঙ্গলকাব্য: ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট*। কলকাতা: এসিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৫।

[৫] ভট্টাচার্য, সুশীল। *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য ও দর্শন*। ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৭।

[৬] সেন, হরপ্রসাদ। *বাংলার মঙ্গলকাব্য ও সামাজিক নৈতিকতা*। কলকাতা: প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১২।

[৭] বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ। *মঙ্গলকাব্য ও মানবিক দ্বন্দ্ব*। কলকাতা: সংস্কৃতি প্রকাশন, ২০১৮।

[৮] রহমান, আবু নঈম। *সাহিত্যের মাধ্যমে মধ্যযুগীয় বাংলা সমাজ*। ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৪।

[৯] মজুমদার, সমীর। *মঙ্গলকাব্যে আচরণ, নৈতিকতা ও কর্তব্য*। কলকাতা: ইন্ডিয়ান লিটারেচার পাবলিকেশনস, ২০১৯।

[১০] ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ। *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারা*। হাউস অফ বুকস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৭।

[১১] চৌধুরী, আরিফ। *মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মানবতাবাদ ও নৈতিক চিন্তা*। ঢাকা: বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ২০২০।

[১২] বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড*। মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০০৬-০৭ সংস্করণ।

[১৩] ভট্টাচার্য,আশুতোষ। *বাইশ কবির মনসা-মঙ্গল বা বাইশা*। কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৪।

[১৪] বিজয়গুপ্ত, পদ্মাপুরাণ। *জয়ন্ত কুমার দাসগুপ্ত সম্পাদিত*। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২।

[১৫] পোদ্দার, অরবিন্দু। *মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ ১৯৯৯।

[১৬] চৌধুরী, শ্রী ভূদেব। *বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*। কলকাতা: দেশ পাবলিশিং, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।

[১৭] সেনগুপ্তা, জয়া। *মনসামঙ্গল কাব্যের সামাজিক পটভূমিকা ও নারী*। ঢাকা: বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯০।

[১৮] চক্রবর্তী, অরূপ। "রূপগঠনতাত্ত্বিক পর্যালোচনার আলোকে মনসামঙ্গল কাব্য।" *International Refereed Research Journal (IRRJ)*: A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture 1, bs 2 (Gwc^{a}j 2025): 18-42| https://trrj.org.in/all-issue

[১৯] "মনসামঙ্গল।"উইকিপিডিয়া। Accessed June 5, 2025| https://bn.wikipedia.org/wiki

[২০] "মনসামঙ্গল।"বাংলাপিডিয়া। Accessed June 15, 2025| https://bn.banglapedia.org/index.p